

সাঁওতালদের লোককাহিনী ও প্রকৃতির সন্তান হিসাবে সাঁওতালদের অধ্যয়ন

বাবলু মূর্মু

বিমূর্ত:

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো সাঁওতাল উপজাতির আবাসস্থল। যদিও তারা বিভিন্নদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তবে বেশির ভাগ সাঁওতাল ভারত ও বাংলাদেশে পাওয়া যায়। সাঁওতাল লোকেরা নিজেদেরকে মূলত প্রাকৃতিক প্রাণী হিসেবে বর্ণনা করে। এই দাবির কিছু পণ্ডিতদের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়া গেছে যারা সাঁওতাল আচার-অনুষ্ঠান এবং উৎসব বিশ্লেষণ করেছেন। তবে খুব কম গবেষণাই সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাঁওতালদের পরিচয় সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছে। অতএব, তাদের লোককাহিনী পরীক্ষা করে, এই নিবন্ধটির লক্ষ্য এই ধারণাটি প্রদর্শন করা যে সাঁওতালরা প্রকৃতির সন্তান। গবেষণাটি জাতীয় লোককাহিনী তত্ত্ব, সাংস্কৃতিক কার্যকরী তত্ত্ব এবং বাস্তবতার তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। গুণগত গবেষণাটি ২৭ টি সাঁওতাল লোককাহিনীর পাঠ্য বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। এই কাজের যুক্তি হল যে সাঁওতাল লোককাহিনী গুলি তাদের প্রথা, সংস্কৃতি এবং পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞানের ভান্ডার হিসাবে কাজ করে। গবেষণার ফলাফল থেকে, এটা স্পষ্ট যে সাঁওতালরা প্রকৃতিতে এবং তার মধ্যে বাস করে। তাদের প্রকৃতির সাথে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে যেমন একজন পিতামাতা বা ভাইবোনের সাথে থাকে। তারা তাদের জীবন ধারায় প্রকৃতির সরলতা অনুকরণ করে। এমনকি তারা যে আত্মাদের উপাসনা করে এবং শ্রদ্ধা করে তারা প্রকৃতিতে বাস করে বলে মনে করা হয়। সুতরাং, সাঁওতালরা প্রকৃতি থেকে জন্মগ্রহণ করে এবং প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণীর সাথে পারস্পরিক ভাবে উপকৃত হয় এবং ভাগ করা জায়গায় বিদ্যমান থাকে।

মূলশব্দ: সংস্কৃতি, প্রকৃতির সন্তান, সাঁওতাল পরিচয়, ঐতিহ্য

১.০ ভূমিকা

সাঁওতালরা বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধান উপজাতিদের মধ্যে অন্যতম। তারা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড (কেরকেটা, ২০১৮) এর বংশধর। তারা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বসবাস করেছে। কেরকেটার মতে, খ্রিস্টের আগে এবং মুসার আগেও সাঁওতালরা সেখানে বাস করত বলে বিশ্বাস করা হয়। যাই হোক, দিওয়ারকার (যেমন কেরকেটা, ২০১৮-এ উদ্ধৃত হয়েছে) দাবি করেছেন যে ভারতে মানুষের অস্তিত্ব ৫০০০-৫৫০০ বছর (পৃ. ২৪) আগে খুঁজে পাওয়া যায় এবং প্রোটো-অস্ট্রালয়েড আদি মানুষের মধ্যে ছিল। প্রকৃতপক্ষে, পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে একমত যে সাঁওতালরা ভারতের প্রথম বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল। ভারত থেকে সাঁওতালরা অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিছু পণ্ডিত সাঁওতালরা মূলত বেবিলনে বাস করত বলে মনে করেন। সাঁওতালরা পারস্য, আফগানিস্তান এবং চীনা টারটারিতে বাস করত। যদিও কোনো প্রমাণিত নথি নেই, সাঁওতাল লোকেরা তাদের জন্মস্থান হিহিরি পিপিহি হিসাবে দাবি করে, বর্তমান পাকিস্তানের কোথাও (কেরকেটা, ২০১৮, পৃ. ২৩)।

অন্যান্য পণ্ডিত যেমন- সোরেন, প্রিয়াঙ্কা ও জামির, ওয়ালুনেবা (২০২১) মনে করেন যে সাঁওতালরা ভারতের বাইরে থেকে এসেছে, যদিও কোনটিই মূল স্থানের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে স্পষ্ট নয়। তবুও, সাঁওতালরা বিশ্বাস করে যে তারা ভারতের কোথাও থেকে এসেছে। সাঁওতালদের সৃষ্টি কথায় পৌরাণিক কাহিনী দেখায় যে তাদের প্রথম পিতামাতা একটি পাখির ডিম থেকে বাচ্চা হয়ে বেরিয়েছিল। এই বর্ণনা অনুসারে, প্রথম দিকে সর্বত্র জল ছিল। এই মহাবিশ্বে শুধুমাত্র সমুদ্রের প্রাণী এবং আত্মা ছিল। একদিন, ঠাকুর জিউ (দেবতা) নামে পরিচিত পরমাত্মার কন্যা সমুদ্রে স্নান করছিলেন। গোসল করতে গিয়ে নিজের শরীরের ময়লা থেকে দুটি পাখি তৈরি করলেন। তারপর তিনি পাখিগুলোকে তার বাবার কাছে নিয়ে এলেন যাতে তাদের জীবন দেওয়া যায়। তাঁর বাবা তাদের জীবন দিয়েছেন, এবং পাখিরা মহাবিশ্বের চারপাশে উড়তে শুরু করেছে। পরে, ঠাকুর জিউ পৃথিবী তৈরি করেছিলেন যাতে পাখিরা বিশ্বামের জায়গা পায় এবং বাসা বাঁধতে পারে। একবার তারা বিশ্বামের জায়গা পেয়ে গেলে, স্ত্রী পাখি দুটি ডিম দেয় যেখান থেকে সাঁওতালদের প্রথম পিতামাতা জন্মগ্রহণ করেন (হাসদক, ১৯৮১, পৃ. ২০)। সাঁওতালরা তাদের সংস্কৃতি লালন করে এবং সর্বত্র পালন করে। তাদের সম্প্রদায় বারোটি গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। একই বংশের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। সৃষ্টির শুরু থেকে, সাঁওতালরা কৃষিকাজ এবং শিকারের সাথে জড়িত। তাদের উৎসবের সময়, তারা ভাত খেতে, মদ্য পান করতে এবং নাচতে ভালোবাসে। সাঁওতালরা তাদের সম্প্রদায়ে থাকতে পছন্দ করে, যার প্রত্যেকটির আলাদা প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে। প্রশাসন সম্প্রদায় পরিচালনা করে এবং বিপদের সময় সদস্যদের রক্ষা করে। সাঁওতাল পরিবার সমাজ কাঠামোর বাইরে থাকতে পারেনা। যেমন, কেউ বড় অপরাধ করলে প্রশাসন তাকে সাময়িক ভাবে শাস্তি হিসেবে সমাজ থেকে বহিস্কার করে। তবুও সাঁওতালরা শাস্তি প্রিয় মানুষ। বর্তমানে, সাঁওতালদের জনসংখ্যা অনুমান করা হয়েছে ৭.৫ মিলিয়ন, যা বাংলাদেশ, ভুটান এবং নেপাল ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাদের স্বতন্ত্রতা থাকা সত্ত্বেও, সাঁওতালরা বিভিন্ন সংস্কৃতির লোকদের সাথে যোগাযোগ করেছে যখন তারা বিভিন্ন জায়গায় চলাফেরা করে এবং বসবাস করে এবং সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন, ভারত এবং বাংলাদেশের কিছু অংশে, তাদের অনন্য সংস্কৃতিগুলি অন্য গোষ্ঠীগুলির থেকে খুব কমই আলাদা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সাঁওতালরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং যদিও তাদের অধিকাংশই তাদের ঐতিহ্যগত ধর্ম ধরে রেখেছে, অনেকেই এখন বিভিন্ন ধর্ম পালন করে, বিশেষ করে হিন্দু ধর্ম এবং খ্রিস্টান ধর্ম (খন্দেকার, ২০০০)।

১.১ সমস্যা বিবৃত

সাঁওতাল সংস্কৃতির ক্রম বর্ধমান পরিবর্তন সময়ের সাথে সাথে সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত সাহিত্যকেও ধীরে ধীরে ক্ষয় করেছে। শুধুমাত্র কিছু সাঁওতাল এখনও গল্প বলার অনুশীলন, কবিতা আবৃত্তি এবং অন্যান্য সাহিত্যের অভিনয় পালন করে। এদিকে, সাঁওতাল সাহিত্য এবং সময়ের সাথে সাথে এর রূপান্তর নিয়ে সীমিত গবেষণা রয়েছে। এটির আংশিক কারণ আধুনিক সাঁওতালরা সাধারণ ভাবে সাহিত্যের প্রতি উদাসীন বলে মনে হয়। কিছু অ-সাঁওতাল তাদের সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বহিরাগত দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার চেষ্টা করেছে (গৌতম, ১৯৭৭)। তবে, অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকোণ থেকে সাঁওতাল সাহিত্যের উপর কোন গবেষণা পাওয়া যায়নি। তাই, এই গবেষণায় সাঁওতাল সাহিত্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অনন্য সমৃদ্ধ মাধ্যম হিসেবে নথিভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল সাঁওতাল সাহিত্যের গুরুত্ব তুলে ধরা, এটি সাঁওতালদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উপর আলোকপাত করে এবং সাহিত্যের মাধ্যমে সমাধান করার

চেষ্টা করে। বর্তমানে অনেক সাঁওতাল পরিচয়ের সংকটে ভুগছে। জাতি হিসাবে তাদের স্বতন্ত্রতা এবং তাদের পরিচয়ের উপর খুব বেশি গবেষণা নেই। অনেকে দাবি করেন যে সাঁওতালরা শাস্তিপ্রিয় মানুষ (ক্যাভালারো, ফ্রান্সেস্কো এবং রহমান, তনিয়া। (২০০৯)। এখনও অনেকে মনে করেন যে সাঁওতালরা আনন্দের মানুষ (আলি, ১৯৯৮)। তবে, এই দাবিগুলির মধ্যে থেকে অভিজ্ঞতামূলক তথ্য নেই। তাদের সমর্থন করার জন্য সাঁওতাল বৃত্তি প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, সময়ের সাথে সাথে, অনেক সাঁওতাল অন্যদের সাথে যোগাযোগ করার সময় তাদের স্বতন্ত্রপরিচয় হারিয়েছে বলে মনে হয়। সাঁওতাল লোককাহিনীগুলি পরীক্ষা করে, এই অধ্যয়নের লক্ষ্য সাঁওতালদের অনন্য পরিচয় উন্মোচন করা এবং উপস্থাপন করা। সম্প্রদায়ের নতুন প্রজন্ম নতুন করে আবিষ্কার করে যে তারা কারা। গবেষণাটি যুক্তি দেয় যে সাঁওতালরা প্রকৃতির সন্তান, তাদের লোককাহিনী থেকে এর প্রমাণ মেলে। গবেষণাটি সাঁওতাল সাহিত্যের সমৃদ্ধতাকে তাদের মানুষের পরিচয়ের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরীক্ষা করে।

২.০ সাহিত্য পর্যালোচনা:

সাঁওতালদের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং লোককথার মধ্যে একটি সংযোগ রয়েছে, যা অনেক শিক্ষাবিদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ক্যানি (১৯২৮), তার লেখায় সাঁওতাল সাহিত্যের গভীরতার জন্য উপলব্ধি প্রদর্শন করেন। লেখক উল্লেখ করেছেন যে, সাঁওতাল লোককাহিনী সাঁওতাল ঐতিহ্যের প্রতিফলন। দত্ত (২০১৮) তাঁর লেখায় সাঁওতাল লোকআখ্যানও পরীক্ষা করেছেন। পণ্ডিতরা সাঁওতালদের সাথে জমিদার ও বিজয়ীদের নিষ্ঠুর আচরণের প্রমাণ প্রদান করেন, যেমনটি কিছু সাঁওতাল আখ্যানে ধরা আছে। দত্ত তারপর উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, সাঁওতালদের কিছু লম্বা গল্প তাদেরই ইতিহাসের প্রতিফলন। একইভাবে দেখেছেন যে, সাঁওতাল গল্পে বর্ণিত জাদুবিদ্যার কার্যকলাপগুলি সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত সেই অনুশীলনগুলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন, গল্পগুলো স্যাটানাল সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ চেহারা প্রদান করে। সাঁওতাল গল্পের একটি পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে লেখক আরও উল্লেখ করেছেন যে, সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি মূলত পুরুষতান্ত্রিক ছিল যার ফলে সাঁওতাল সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের স্থান ছিলনা। তাই, রাজের দৃষ্টিতে, মহিলারা সমাজে ক্ষমতা প্রয়োগের আকাঙ্ক্ষার আউটলেট হিসাবে জাদুবিদ্যার চর্চা করত। সাঁওতাল লোককাহিনী নিয়েও গবেষণা করেছেন, বিশেষ করে সাঁওতাল জনগণের সমষ্টিগত অবচেতনের উপর ফোকাস করে যা তাদের লোককাহিনীতে ধরা পড়েছে। এগুলি ছাড়াও, তিনি বর্ণনাগুলির মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলি চিহ্নিত করেছিলেন। লেখক দেখিয়েছেন যে, সাঁওতালদের সৃষ্টি মিথ তাদের জন্য সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁর বক্তৃতায় প্রতিধ্বনিত, করম-বিস্তি (যা সাঁওতালদের সৃষ্টি মিথকে আবৃত্তি করে) সাঁওতাল পরিচয়কে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে কারণ এটি সৃষ্টি মিথের একটি উদ্ধৃতি। এটি সাঁওতাল পরিচয়কে বাঁচিয়ে রাখে কারণ এটি এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে চলে যায়। করম-বিস্তির অনুরূপ গবেষণায়, ট্যাঙ্ক (২০১৯) আরও লিখেছেন যে সহস্রাব্দ সাঁওতালরা তাদের পরিচয় নিয়ে চিন্তিত। তাঁর দৃষ্টিতে করম-বিস্তি হারানো সাঁওতাল পরিচয়কে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। সিওয়াকোটি এবং ট্যাঙ্ক উভয়ই দেখান যে করম বিস্তী সাঁওতালদের পরিচয় সংজ্ঞায়িত করার একটি মাধ্যম। রাজ (২০১৮) যুক্তি দেন যে সাঁওতাল সৃষ্টির পৌরাণিক কাহিনী অ-মানুষ, প্রাণী এবং আত্মাদের সাথে সম্প্রদায়ের সম্পর্কে আভার লাইন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি তার (২০১৮) সাথে অনুরণিত হয় যিনি সাঁওতালদের আত্মা উপাসক হিসাবে চিহ্নিত করেন। সাঁওতালদের মধ্যে পরিচয় হারিয়ে যাওয়ার পেছনে বিভিন্ন কারণকে দায়ী করা হয়েছে। সামাদ বাংলাদেশী সাঁওতালদের অধ্যয়ন করেন এবং একদিকে তাদের ভূমি ও সংস্কৃতির ক্ষতি এবং অন্যদিকে তাদের পরিচয় হারানোর মধ্যে

একটি সংযোগ খুঁজে পান। লেখক আরও লক্ষ্য করেছেন যে চা-বাগানের সাঁওতালদের অবস্থা সমতল ভূমির সাঁওতালদের চেয়ে বেশি শোচনীয় কারণ তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যচর্চার সুযোগ নেই। তারা অন্যান্য উপজাতির মধ্যে এতটাই নিমজ্জিত যে কেউ তাদের অনন্য সাঁওতাল পরিচয় চিনতে পারে না। শরীফ (২০০৮) সামাদ (২০০৬) এর যুক্তিকে সমর্থন করেন যে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের জন্য সাঁওতালরা বহিরাগত শক্তি দ্বারা লক্ষ্য বস্তু হয়েছে। তিনি বিশেষ ভাবে রাজনৈতিক চাপকে সাঁওতাল সংস্কৃতি ও পরিচয়ের একটি বড় বিঘ্নকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশ সরকার একটি উপজাতি হিসাবে তাদের পরিচয় অস্বীকার করেছে, পরিবর্তে তাদের বর্ণনা করেছে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী (একটি বাংলা শব্দ যার অর্থ ছোট উপ-উপজাতি), যা তাদের একটি উপ-উপজাতির সাথে সমতুল্য করে। আকান এটআল (২০১৫) আরও মন্তব্য করেছেন যে সরকার এবং জনসাধারণ শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাঁওতালদের ব্যাপক ভাবে উপেক্ষা করেছে। অনেক সাঁওতাল বর্তমানে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হওয়ার কারণে এই দৃষ্টিভঙ্গি ঘটনা গুলিকে ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্বায়নের প্রভাবকে সাঁওতাল সমাজের রূপান্তরের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এখন আগের চেয়ে বেশি, বেশির ভাগ লোক তাদের এলাকার বাইরে কাজ করে এবং শহরে বাস করে। তাই বিশ্বায়ন মানুষকে বাধ্য করেছে অন্য সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে। সাঁওতাল রূপান্তরের কারণ হিসেবে বিশ্বায়ন এবং অভিবাসনকেও উল্লেখ করেছেন। গুহ এবং ইসমাইল (২০১৫) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালদের জীবন নিয়ে গবেষণা করেছেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে সাঁওতালরা বর্তমানে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তারা এমন একটি জমিতে বহুলাংশে কৃষি-নির্ভর জীবন যাপন করে যা তার উর্বরতা হারিয়েছে। সমসাময়িক সাঁওতাল জনসংখ্যার অধিকাংশই তাদের ঐতিহ্যবাহী নাচ ও গানের প্রতি অনাগ্রহী বলে মনে হয়। যাই হোক, চ্যালেঞ্জ এবং অসুবিধার মধ্যেও, গুহ এবং ইসমাইল আধুনিক সাঁওতালদের সুখী বলে বর্ণনা করেছেন। একই ভাবে, বিশ্বাস (২০১৮) আধুনিক সাঁওতালদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষা, বিশ্বাস এবং পেশা সম্পর্কে তার গবেষণায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে সম্প্রদায়টি আর প্রাচীন কালের বিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী উপজাতি নয়। সাঁওতালরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও শিক্ষার সংস্পর্শে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতে অন্য একটি গবেষণায়, রায় (২০১৬) লক্ষ্য করেছেন যে সাঁওতালরা ধর্মীয় লাইনে গভীর ভাবে বিভক্ত। নতুন ধর্ম, যেমন খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলাম, পাশ্চাত্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে, সাঁওতালদের ঐতিহ্যগত বিশ্বাস ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতিগুলিকে অনেকাংশে প্রতিস্থাপন করেছে। একই ধরনের গবেষণায়, শামসুদ্দোহা এবং জাহান (২০১৬) আবিষ্কার করেছেন যে, ধর্মীয় শক্তিগুলি সাঁওতাল সমাজকে ব্যাপক ভাবে পরিবর্তন করেছে। এই হিসাবে, লেখক বর্তমানে তিন ধরনের সাঁওতাল চিহ্নিত করেছেন, যথা সাফাহোর (পরিচ্ছন্ন রাস্তার অনুসারী) সাঁওতাল (হিন্দু), উমহর (বাগুাইজিত পথের অনুসারী) সাঁওতাল (খ্রিস্টান), এবং বঙ্গাহর (আত্মার পথের অনুসারী) সাঁওতাল (সনাতন ধর্মের অনুসারী)। নৃতাত্ত্বিক শামসুদ্দোহা এবং জাহান আধুনিক সাঁওতালদের রূপান্তরের পেছনের শক্তিগুলিকে গণনা করেছেন: রাষ্ট্রীয় বৈষম্য, খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মাস্তর, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং জন সাধারণের প্রাস্তিকতা। শামসুদ্দোহা এবং জাহান (২০১৬) বর্ণনা করেছেন যে সাঁওতালরা তাদের সংস্কৃতি এবং দেশকে রক্ষা করার জন্য মহান ত্যাগ স্বীকার করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৫৫ সালে, তারা ব্রিটিশ উপনিবেশকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করেছিল। আরও দাবি করে যে সাঁওতালরা ব্রিটিশ উপনিবেশকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে সুপরিচিত। দেশের জন্য এই সব আত্মত্যাগ সত্ত্বেও, শামসুদ্দোহা এবং জাহান দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, ভারত ও বাংলাদেশ উভয় সরকারই সাঁওতালদের পুরোপুরি স্বীকৃতি দেয়নি। এই লেখকদের মতে, উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সংগ্রামে তাদের ভূমিকার জন্য সাঁওতালদের প্রশংসা করা উচিত। সাঁওতালরা তাদের সংস্কৃতি ও

পরিচয় বিভিন্ন উপায়ে উৎযাপন করে। Lea (২০১৬) বাহা উৎসব (ফুল উৎসব) চিহ্নিত করে, স্থানীয় ভাবে এটিকে বলা হয় দিসম বাহা উৎসব (দেশীয় ফুল উৎসব), একটি উপায় হিসাবে সাঁওতালরা তাদের অনন্য সাংস্কৃতিক পরিচয় উৎযাপন করে এবং প্রকাশ করে। Carrin (২০১৫) লুণ্ডবুরু তীর্থযাত্রাকে আরেকটি ইভেন্ট হিসাবে চিহ্নিত করেছেন যা সাঁওতালরা তাদের পরিচয়কে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহার করে। এই অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন এলাকা থেকে সাঁওতালদের একত্রিত করে সংহতি প্রদর্শন এবং তাদের পরিচয় উৎযাপন করার জন্য। বন্দ্যোপাধ্যায়ের (২০১৯) মতে, লুণ্ডবুরু একটি প্রকৃত শারীরিক তীর্থ যাত্রা নয় বরং সাঁওতাল পরিচয়ের পুনর্নিশ্চিত করণ। আচার্য এবং ক্ষত্রিয় (২০১৬) আরও লক্ষ্য করেছেন যে, আধুনিক সাঁওতালরা গুল-চিকির মাধ্যমে তাদের পরিচয়কে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে (১৯২৫ সালে সাঁওতাল পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু দ্বারা উদ্ভাবিত সাঁওতালদের ভাষা লেখার জন্য ভাষার লিপি) এবং সারনা ধরম (সাঁওতালদের অন্যতম ধর্ম) আন্দোলন। পর্যালোচনা করা সাহিত্য দেখায় যে অনেক গবেষণা সাঁওতালদের জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। কিছু অধ্যয়ন তাদের ইতিহাসের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে, কিছু তাদের জীবন এবং অস্তিত্বের বর্তমান পরিস্থিতির উপর এবং অন্যরা তাদের পরিচয় পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা পরীক্ষা করেছে। সাহিত্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, সাঁওতালদের নতুন প্রজন্ম তাদের পরিচয় সম্পর্কে একটি স্পষ্টীকরণ চায়। তবুও, পর্যালোচনা করা কেউই প্রকৃতি বা তাদের পরিবেশের সাথে সাঁওতালদের পরিচয়কে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেনি, বিশেষ করে সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই, এই গবেষণায় সাঁওতালদের লোককাহিনী থেকে আঁকা প্রকৃতির সন্তান হিসেবে তাদের পরিচয় সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩.০ পদ্ধতি

প্রকৃতির সন্তান হিসাবে সাঁওতালদের পরিচয় সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করার জন্য, এই গবেষণাটি সাঁওতাল লোককাহিনী পরীক্ষা করে। গবেষণা প্রকৃতির গুণগত ছিল। পদ্ধতিটি উপযুক্ত ছিল যেহেতু গবেষকরা এর সেটিংয়ে একটি সামাজিক সমস্যা পর্যবেক্ষণ করেছেন। এটি সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, মতামত, আচরণ এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়েও কাজ করে। গ্রন্থগুলি ভারতে ধর্মপ্রচারকদের প্রথম সংগ্রহ। গবেষণাটি ২৭টি গল্পের নমুনা সংগ্রহ থেকে গড়ে উঠেছে। নমুনাকৃত গল্পগুলো হল: সিন্দুরা গাঁগারুর গল্প; গুমধাদ্য হিরো; লাখন এবং বন্য মহিষ; শিয়াল এবং চিতাবাঘ; হনুমান ছেলের গল্প; পরিবর্তিত বাছুর; দুখু ও বোঙ্গা বউ; ঘর বঙ্গা; বঙ্গের ভিকটিম; বৃদ্ধ মহিলা যিনি মারা গিয়েছিলেন এবং তার পুত্রকে রেখে গেছেন; কিভাবে নেদারওয়াল্ডের রাজার বার্তা বাহক একজন ধনী বুড়োমানুষ দূরে নির্বাসিত হন; যে যুবক তার মৃত স্ত্রীকে আবার দেখেছে; বাঘের বধু; বানর এবং মেয়ে; বানর স্বামী; পালো; যখন তারা ভাই ও বোনকে বিয়ে করার চেষ্টা করে; অলসতা নিরাময়; দুইভাই ঝোরিয়া ও ঝোর; বাঘ এবং উল্টার মা; কারা গুজা; দি সিস্টারস-ল; রাজিত বঙ্গ; দ্য হার্ডবয় অ্যান্ড দ্য উইচেস; দ্য সিলি উইমেন; নাথিং মাস্ট টু টোল্ড টু উইমেন, এবং এক সৎমা। অধ্যয়নের জন্য ডেটা নির্বাচিত করে লোক কাহিনীগুলিকে ঘনিষ্ঠ পাঠের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল। গবেষণাটি ডেটা প্রক্রিয়ায় করার জন্য পাঠ্য বিশ্লেষণ ব্যবহার করেছিল।

৪.০ তাত্ত্বিক কাঠামো

গবেষণাটি তিনটি তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যথা ন্যাশনাল ফোকলোর থিওরি, ফাংশনাল থিওরি এবং থিওরি অফ

ফোকলোর অ্যান্ড রিয়ালিটি। ডোরসন (১৯৬৩) অনুসারে ন্যাশনাল ফোকলোর থিওরি মনে করে যে জাতীয় উপাদানগুলি মানুষের জ্ঞানের মধ্যে লুকিয়ে আছে। যেমন, মানুষের বিদ্যা একটি জাতিকে সংজ্ঞায়িত করতে পারে বা মানুষকে একটি জাতি হিসাবে নিজেদেরকে সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করতে পারে। তত্ত্বটি সাঁওতালদের পরিচয় সংজ্ঞায়িত করে এমন গল্পের উপাদানগুলি সনাক্ত করতে গবেষণাকে সাহায্য করেছিল। কার্যকরী তত্ত্বটি ফ্রাঞ্জ বোস (১৯৪০) এবং উইলিয়াম বাসকম (১৯৫৩) দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল। বোয়াস এর প্রকৃতির কারণে একে 'সাংস্কৃতিক প্রতিফলক তত্ত্ব' (লোপেজ, ২০০৬, পৃ. ৬২) বলেছেন। তত্ত্বটি লোক কাহিনী এবং সংস্কৃতির মধ্যে একটি সংযোগ আঁকতে সাহায্য করেছিল। এর প্রধান যুক্তি, লোক কাহিনীর অধ্যয়ন হল মানুষের অধ্যয়ন। অতএব, লোককাহিনী হল 'একজন মানুষের আত্মজীবনী' (লোপেজ, ২০০৬, পৃ. ৬২)। Bascom (১৯৫৩) অনুসারে, লোককাহিনী ১) সংস্কৃতির আয়না হতে পারে; ২) সংস্কৃতির দিক গুলি যাচাই করতে পারে; ৩) শিক্ষার একটি মাধ্যম হতে পারে এবং ৪) আচরণের স্বীকৃত নিদর্শনগুলির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য কাজ। এই তত্ত্বটি এই ভাবে সাঁওতালদের লোককাহিনী এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সম্পর্ক পরীক্ষা করতে সাহায্য করেছিল। বোয়াসের দাবি যে লোক কাহিনী হল মানুষের আত্মজীবনী, যা এই গবেষণার জন্য উপযুক্ত ছিল। গবেষণায় সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর পরিচয় সংজ্ঞায়িত করার জন্য লোককাহিনী অধ্যয়ন করা হয়েছে। দ্য থিওরি অফ ফোকলোর অ্যান্ড রিয়ালিটির উদ্ভব হয়েছিল বিখ্যাত লোকসাহিত্যিক ভ্লাদিমির প্রপ (১৯৮৪) এর কাজ থেকে, এটি প্রমাণ করার জন্য যে লোককাহিনীর বাস্তবতার সাথে সম্পর্ক রয়েছে। প্রপ যুক্তি দিয়ে ছিলেন যে ১) লোক কাহিনী বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত, এমনকি যদি এটি দুর্দান্ত চিত্র হয়; ২) লোক কাহিনীর অষ্টা এবং অভিনয় শিল্পীরা এই ধরনের সাহিত্যের মাধ্যমে বাস্তব জীবনকে উপস্থাপন করতে চান এবং ৩) একজন লোকশিল্পী নিজেকে বাস্তবতার প্রতিনিধি হিসাবে প্রমাণ করার লক্ষ্য রাখেন (প্রোপ, ১৯৮৪, পৃ. ৩৮)। তত্ত্বটি এই গবেষণাকে সাঁওতালদের প্রকৃত প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করেছিল। বিশেষত, এটি গবেষককে তাদের লোক কাহিনীর পিছনে সাঁওতাল পরিচয় সম্পর্কে সত্য উন্মোচন করতে সাহায্য করেছিল।

৫.০ ফলাফল এবং আলোচনা

৫.১ সাঁওতাল গল্পের প্রেক্ষাপট

নির্বাচিত গল্পের ঘটনাগুলো গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে ঘটেছে। অতএব, গল্পগুলি প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করে, যেমন গ্রাম, জঙ্গল, গাছ, প্রাণী এবং মানুষের সরল জীবন ধারা। চরিত্রগুলি গ্রামের এবং প্রায়শই বনাঞ্চলের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। তারা জঙ্গলের কাছাকাছি বা ভিতরে বাস করে। বেশির ভাগ গল্পের ঘটনা ঘটে বনে, মাঠে বা লোকালয়ে। গল্পে ল্যান্ড স্কেপের প্রাণবন্ত বর্ণনাও সাঁওতালদের বর্তমান এলাকাকে প্রতিফলিত করে। গল্পের সেটিং থেকে থিমগুলিও সাঁওতালদের দৈনন্দিন জীবনের মূল ঘটনাগুলিকে ক্যাচচার করে। এই থিমগুলির মধ্যে রয়েছে প্রাণীদের প্রতি প্রতিশোধ, শিকার, প্রাণী এবং আত্মার সাথে সুরেলা জীবন যাপন, মানুষের চরিত্র, আত্মা, জাদুবিদ্যা, পারিবারিক সম্পর্ক, মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরে জীবন, হাস্যরস এবং আরও অনেক কিছু। এই বিষয়গুলি দেখায় যে কীভাবে সাঁওতাল লোক কাহিনী গুলি সামাজিক ভাবে সম্পর্কিত এবং কীভাবে মানুষ প্রকৃতির সাথে যোগাযোগ করে। সাঁওতালরা বসবাস করে এবং বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এখানে প্রাসাদ, শহর থেকে আসা মানুষ বা কোনো বৈষম্যের উল্লেখ নেই এই গল্পের মানুষের মধ্যে। এখানকার গল্পগুলো রাজনীতি, খুন, চক্রান্ত বা যৌনতা নিয়ে নয় বরং সাঁওতালদের সংগ্রামী ইতিহাস নিয়ে। তাদের

প্রয়োজনের মুহুর্তে, প্রকৃতি মায়ের মতো তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের জন্য খাবার সরবরাহ করে। সাঁওতালরা জঙ্গল থেকে তাদের খাবার সংগ্রহ করে। চরিত্রগুলো বেশির ভাগই কৃষিকাজের সাথে জড়িত। তারা জানে কীভাবে একটি সংকটময় পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ, "লখন এবং বন্য মহিষ" গল্পে নায়ক লখন বন্য মহিষের দুধ পান করে বনে বেঁচে থাকে। আবার, "কারা এবং গুজা" গল্পে, কারা এবং গুজা, দুইভাই, খাবার জন্য কিছু শিকড় খনন করতে বনে যায়। সাঁওতালরা যখন পরাজিত হয় এবং বিপদের সময় তাদের সাহায্য করার মতো কেউ থাকে না, তখন বন্য পশুরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সাঁওতাল লোককাহিনীতে মানুষ ও পশুপাখি এবং আত্মার মধ্যে বিবাহের গল্পও রয়েছে। 'বাঘের বধু', 'বানরের স্বামী' এবং 'দুখু ও বঙ্গবউ'-এ এমন গল্প পাওয়া যায়। এই গল্পগুলো দেখায় যে সাঁওতালরা প্রকৃতির কাছাকাছি। এই ঘনিষ্ঠতা প্রকৃতি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে নিছক অনুভূতির চেয়ে গভীর; এটি একটি আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক সংযোগ যা মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে ভাগ করা জীবন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

৫.২ সাঁওতাল লোককাহিনীর চরিত্রগুলো সরল

গল্পে কোন বিশিষ্ট বা বিখ্যাত চরিত্র বা নায়ক নেই। চরিত্রগুলি সাঁওতাল এবং অ-সাঁওতাল, প্রাণী, প্রকৃতি এবং আত্মা নিয়ে গঠিত, যাদের প্রত্যেকেই প্রকৃতির সাথে এবং প্রকৃতির দ্বারা সংযুক্ত। এইসমস্ত চরিত্রগুলি গল্পে একটি আকর্ষণীয় ভূমিকা পালন করে কারণ তারা সবাই সাঁওতাল ভাষায় কথা বলে। মানুষের চরিত্রগুলির মধ্যে, সাঁওতালরা লোককাহিনীতে সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত। বেশিরভাগ নায়কের পেশা হল গবাদিপশু পালন বা কৃষিকাজ, যা প্রকৃতির সাথে সাঁওতালদের সংযোগের উপর জোর দেয়। তারা তাদের গবাদিপশুকে বনে নিয়ে যায়, যেমনটি দেখানো হয়েছে 'সিন্দুরা গাঁগারুর গল্প', 'গুমধা, বীর', 'লখন এবং বন্য মহিষ' এবং আরও অনেকের মতো। এসব গল্পে চরিত্রগুলো প্রকৃতির কাছাকাছি। তারা প্রকৃতি থেকে তাদের খাদ্য উৎপাদন করে; তারা গবাদি পশুদের জঙ্গলে নিয়ে যায়, কখনও কখনও বন্যপ্রাণীদের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং আবার কখনও প্রতিশোধের জন্য তাদের শিকার করে। সাঁওতাল লোককাহিনীতে, পশুচরিত্রগুলিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা মানুষের সাথে মানুষের ভাষায় কথা বলে। এটি মানুষের অহংকারে পরিবর্তন হিসাবে এই প্রাণীদের প্রতীকীভূতের উপর জোর দেয়। সাঁওতাল গল্পগুলি পশুদের মূর্তিমান করতে পিছপা হয়না। মানুষ সাঁওতাল সংস্কৃতি এবং অস্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসাবে এই প্রাণীদের সম্মান করে। কিছু গল্পে, প্রাণী এমনকি সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়। মানুষ তাদের কথা শোনে। উদাহরণ স্বরূপ, "পরিবর্তিত বাছুর", দুটি প্রাণী, নাইট জার এবং জ্যাকাল, গরীব ছেলে সোনার পক্ষে একটি বিরোধ মেটাতে মানুষের সাথে বসে। তারা জনগণের মুখোমুখি হয় এবং তাদের প্রশ্ন করে, যার উত্তর জনগণ দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত, তারা রায়ে জয়ী হয় এবং জনগণ তাদের রায় মেনে নেয়। আত্মারাও এই গল্পগুলোর উল্লেখযোগ্য চরিত্র। অনেক সাঁওতাল লোককাহিনীতে আত্মারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আত্মা মানুষের রূপ নিতে পারে এবং মানুষের সাথে বসবাস করতে পারে। লোক কাহিনীতে দেখানো হয়েছে, আত্মারা পুকুর, নালা (স্রোত) বা যে কোনো জলের উৎসে বাস করে। এই আত্মাগুলো প্রকৃতির বাইরে নয় বরং প্রকৃতির অংশ। লোককাহিনীতে বিভিন্ন ধরনের চেতনা উপস্থাপন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দূষিত, যেমন 'রামজিৎবঙ্গ' এবং 'দ্যা সিস্টার-ল-লছ ওয়াইচ'-এর আত্মা। যাই হোক, কিছু আত্মা জাদুকরী সম্মানকারী থেকে মানুষকে রক্ষা করে। অন্যান্য আত্মা মানুষের সাথে বিয়ে করে। সাঁওতাল লোককাহিনীতে, মানুষ, আত্মা এবং প্রাণী সম্প্রদায় গল্পের অংশ। তাদের সবই প্রকৃতির মাধ্যমে সংযুক্ত। তারা সবাই এক সঙ্গে কাজ করে, তারা একে অপরকে সম্মান করে এবং কোন বিচ্ছিন্নতা নেই। এভাবে সাঁওতাল সহ সব চরিত্রই প্রকৃতির সন্তান।

৫.৩ হিরোদের প্রাক-পেশা

সাঁওতাল লোককাহিনীতে কোন বিখ্যাত নায়ক নেই; এখানে, নায়করা সাধারণ বা সাধারণ মানুষ। আসলে, কিছু গল্পে, বাকিদের থেকে মূল চরিত্রটি আলাদা করে চিত্রিত করা কঠিন। প্রতিটি চরিত্র অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও তাদের কাজগুলিও সহজ এবং সাধারণ। সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিকূলতাকে জয় করাই হল গল্পের বেশির ভাগ নায়কের প্রধান প্রাক-পেশা। অধিকাংশ নায়ক ছাগল পালনের সাথে জড়িত। ‘দ্য স্টোরি অফ সিন্দুরা গান্ডগারু’, ‘গুমধা, দ্য হিরো’ এবং ‘লখন অ্যান্ড দ্য ওয়াইল্ড বফেলোস’-এ নায়কদের প্রধান কাজ ছাগল পালন। তবে ‘দুখু ও বঙ্গ বউ’-এ নায়ক একজন গোপালক যিনি মহিষের দেখাশোনা করেন। প্রায় প্রতিটি সাঁওতাল লোককথাই প্রকৃতির সাথে মিথস্ক্রিয়া প্রয়োজন এমন কিছু কাজে নিযুক্ত তার নায়কদের উপস্থাপন করে। সাঁওতাল গল্পের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল কৃষি কাজ। কিছু প্রধান চরিত্র জমিচাষ করে এবং মাঠে কাজ করে। ‘হনুমান ছেলে’, ‘দুখু ও বঙ্গ বউ’, ‘বানর ও মেয়ে’, ‘বানরের স্বামী’, ‘পালো’ এবং অন্যান্য গল্পগুলি নায়ক এবং অন্যান্য চরিত্রের কৃষি কাজকে তুলে ধরে। চরিত্ররা ফসল ফলানোর জন্য জমি চাষ করে। কৃষি কাজ ও পশুপালন থেকে জীবিকা নির্বাহ করে তারা সহজ ও সুখী জীবন যাপন করে। এই স্রষ্টাকে বিভিন্ন ভাবে মারাংবুরু (সর্বোচ্চ দেবতা বা আক্ষরিক অর্থে — দ্য গ্রেট মাউন্টেন) বা ঠাকুর জিউ (জীবন দাতা) বলা হয় এবং তিনিই হলেন ‘সকল কারণের কারণ’, গভীর অর্থে সাঁওতাল ধর্মকে একেশ্বরবাদী এবং সেই সাথে সর্বৈশ্বরবাদী করে তোলে। বোঙ্গার বেশ কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বোঙ্গা হলেন - মারাংবুরু, ইনি এর সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত এবং সমস্ত সাঁওতালদের দ্বারা পূজ্য। এছাড়াও অন্যান্য দেব-অর্চনা ও পূজো করা হয়; এর মধ্যে রয়েছে — মারাং বুরু বোঙ্গা, জাহের এরা বোঙ্গা এবং গোসাইকু। অন্যান্য বোঙ্গা, যাদেরকে কম শক্তিশালী বলে মনে করা হয়, তারা হল গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আত্মা, যাদেরকে দেবী করা হয়েছে। এছাড়াও আরও একটি শ্রেণী আছে যারা মন্দের আনয়ক হিসেবে ভয়ের কারণ। এই আত্মাগুলি কোন পুরোহিতের দ্বারা প্রসন্ন হয় না বরং ওবা নামক একজন ঔষধ-ব্যক্তিদ্বারা প্রসন্ন হয়। যাই হোক, বোঙ্গা এর অর্থ হল বিশ্বের একটি অতিপ্রাকৃত শক্তি এবং ভাল বা মন্দের সাথে এর কোন নির্দিষ্ট অর্থে যোগ নেই। তদুপরি, এই বোঙ্গাগুলি নির্দিষ্ট বস্তুকে বোঝায় না বরং সেই অদৃশ্য শক্তিকে বোঝায় যা নিয়ন্ত্রণ করে বা সেই বস্তুগুলির সাথে যুক্ত।

লোককাহিনীতে চিত্রিত সাঁওতাল সমাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাক-পেশা হল শিকার। শিকার করা হয় খাবারের জন্য এবং মানুষের ক্ষতি করে এমন প্রাণীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। উদাহরণ স্বরূপ, “দ্য স্টোরি অফ সিন্দুরা গাঁও গারু”র নায়ককে তার পিতার হত্যাকারী একটি বিশালাকার পাখি সিন্দুরা গান্ড গারুর শিকার করতে গিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে। একই ভাবে, “লখন এবং বন্য মহিষ”-এ নায়ক, লখনকে চিত্রিত করেছে বন্য মহিষ শিকার করতে যাচ্ছে এমন রূপে কারণ তারা তার ফসল ধ্বংস করেছে। যাই হোক, সে তাদের বন্ধু হয়ে ওঠে। লখন এবং মহিষের মধ্যে মিলন ঘটতে পারে এমন ঘটনাটি দেখায় যে সাঁওতাল বিশ্ব দর্শনে মানুষ এবং পশু প্রকৃতির মধ্যে একটি পাতলা রেখা রয়েছে। “বোঙ্গার ভিকটিম” ভিন্ন কারণ, এখানে, চার ভাই মাংস সংগ্রহ করতে পশু শিকারে যায়। উপসংহারে বলা যায় গবেষণায় দেখা গেছে যে সাঁওতাল সমাজে করা তিন ধরনের কাজই (পালন, কৃষি ও শিকার) প্রকৃতির অংশ। যদিও পৃথিবীর সব কিছুই বৃহত্তর অর্থে প্রকৃতির অংশ, তবুও সাঁওতালদের সঙ্গে তাদের জগতের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।

৫.৪ সাঁওতাল বিশ্বাস

অধিকাংশ সাঁওতাল এখনও তাদের ঐতিহ্যগত বিশ্বাস মেনে চলে। তাদের সমস্ত বিশ্বাস প্রকৃতিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। সাঁওতালদের মধ্যে আত্মার বিশ্বাস প্রচলিত। তারা বিভিন্ন ধরনের আত্মায় বিশ্বাস করে, যা তাদের গল্পেও প্রতিফলিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, “দুখু ও বঙ্গ বউ”—এ, দুখু একটি আত্মা মেয়েকে বিয়ে করেন। সে একজন মানুষ হিসেবে দুখুর কাছে আসে এবং তার প্রেমে পড়ে। কিছু আত্মা দূষিত হয়, যেমন ‘ভগ্নি পতি যিনি একজন ডাইনী ছিলেন’ এবং ‘রামজিৎ বঙ্গ’—এ উল্লেখ করা হয়েছে। সাঁওতালরা এই ধরনের আত্মাদের ভয় পায়। যাই হোক, “দ্য হার্ড বয় অ্যান্ড দ্য উইচেস”—এ বেশ কিছু উপকারী বোঙ্গার উল্লেখ করা হয়েছে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের এই আত্মাদের পূজা করার জন্য আলাদা কোনো মন্দির নেই। অরণ্য বা পাহাড়ের মতো প্রকৃতিতে আত্মার পূজা করা হয়। সাঁওতালরাও জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী। বোডিং- এর মতে (যেমন রাজ, ২০১৮-এ উদ্ধৃত হয়েছে), ‘এমন কোনো প্রকৃত সাঁওতাল নেই যে ডাইনিতে বিশ্বাস করেনা।’ তাই, সাঁওতাল সমাজ অত্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক হলেও, ডাইনিরা শক্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। তা সত্ত্বেও, ডাইনিদের ঘৃণা করা হয় এবং পাওয়া গেলে নির্মম ভাবে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। জাদুবিদ্যাকে কেন্দ্র করে সাঁওতালদের অনেক গল্প আছে। সাঁওতালরা যখনই কাউকে ডাইনি দ্বারা আক্রান্ত বা কোনো রোগে আক্রান্ত হতে দেখে, তখনই তারা কবিরাজের (মেডিসিন ম্যান) কাছে যায়। কবিরাজ সকল প্রকার অসুখ ও ব্যাধির চিকিৎসা করেন; তিনি এমন কি যারা মন্দ আত্মা বা মন্দ আত্মা দ্বারা আবিষ্ট বলে বিশ্বাস করা হয় তাদের বর্জন করেন। কবিরাজ তার ওষুধ এবং প্রতিকারের উৎস তৈরি করেন প্রকৃতি থেকে, যেমন গাছের শিকড় বা বাকল। বেশির ভাগক্ষেত্রে, কবিরাজ আরোগ্য আনতে মন্ত্রপাঠ করেন বা দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদান করেন। অতএব, প্রকৃতিই সাঁওতালদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার অনেক উৎস। ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস সাঁওতালদের মধ্যেও প্রচলিত। মাঝিথান— এটি একটি পবিত্র জায়গা (গ্রামের পুরোহিতের পূজার জায়গা), এখানে এইস্থানে গ্রামের পুরোহিত দ্বারা এটির পূজা করা হয় এবং এই পূজার সংস্কৃতি প্রাচীন কাল থেকে অনুসরণ করা হয়। প্রাচীন কালে বিশেষ করে মাধব সিং এবং বিদ্রা সিং-এর সময়ে, যিনি সমস্ত সাঁওতাল উপজাতি সম্প্রদায়কে ডাল্লু পরগণায় নিয়ে যান, এখানে (মাঝিথানের জায়গায়) তারই পূজা অর্চনা করা হয়। তাকে পূজা করা হয় কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে তিনিই একমাত্র, যিনি তাদের সমস্ত অসুস্থতা এবং বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

জাহের থান (একটি গ্রামের শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি স্থান) এখানে এই স্থানে সমস্ত সাঁওতাল উপজাতি সম্প্রদায় তাদের ঈশ্বরের উপাসনা করতে একত্রিত হয় যেমন, মোর-কু, তুরুই-কু, জাহের এরা, গোসাইকু এবং এছাড়াও পারগানা বোঙ্গা। এই পূজা প্রধানত বাহা পোরাবের সময় করা হয়। এই পূজা প্রধানত জাহের আয়ু দেবী কে দেওয়া হয়-যাতে তিনি তাদের সমস্ত দুঃখ দূর করতে পারেন এবং শান্তিময় জীবন প্রদান করতে পারেন।

সাঁওতাল সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে প্রকৃতিই হল ঈশ্বর এবং তাই তাদের প্রকৃতির সন্তান বলা হয়। যদিও তারা অনেক ঈশ্বর ও দেবীর পূজা করেন, দীর্ঘদিন জঙ্গলে বসবাস করায়, তাদের আশপাশে যা পেয়েছেন সেটাই পূজা ও বিশ্বাস করতেন। এই সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে তাদের চারপাশে সব অন্যায়ের প্রতিকার এবং নিরাময়ের একটি মহান স্বর্গীয় শক্তি রয়েছে। প্রকৃতি যে তাদের খাদ্য এবং আশ্রয় প্রদান করে এবং প্রতিটি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তাদের রক্ষা করে। বনে তারা অনেক ঈশ্বর ও দেবদেবীতে ও বিশ্বাস করতে শুরু করে যাকে তাদের স্থানীয় ভাষায় বোঙ্গা বলা হয়। এই সমস্ত বঙ্গার পূজা ও আর্চনার কাজটির দায়িত্ব থাকে গ্রামের পুরোহিতের।

জানগুরু, তিনিই মানুষের অশুভ আত্মা বিতাড়িত করে থাকেন। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করে যে

সেই সময়ে যখন কোনও ব্যক্তির মধ্যে অশুভ আত্মা আসে তখন সাঁওতাল উপজাতির গ্রামের পুরোহিত বা জানগুরু এই থেকে অশুভ আত্মা দূর করবেন। তারা বিশ্বাস করে যে জানগুরু, যেকোনো ব্যক্তির থেকে অশুভ আত্মাকে দূর করার স্বর্গীয় ক্ষমতা রাখে।

সাঁওতাল উপজাতি সম্প্রদায় তাদের বিভিন্ন উৎসব এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঈশ্বর মায়াংবুরুকে পশুবলি দেওয়ার ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি ব্যবহার করে। সাঁওতাল উপজাতিরা এই সংস্কৃতি শুধুমাত্র কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে করে থাকেন। সাঁওতাল সম্প্রদায় তাদের সমগ্র জীবনে তিনটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ধাতুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ধাতুর এই ব্যবহার একটি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি এবং তারা তাদের জীবন যাত্রার তিনটি পর্যায়ে এই ধাতু ব্যবহার করেন এবং এই ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি তারা প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ধাতু ব্যবহারের ধারণাটি একটি ঐতিহ্যগত ভয়াবহ ঘটনা থেকে এসেছে। প্রাচীন কালে এক মহিলা ছিল যিনি একটি নতুন সন্তানের জন্ম দিয়েছিল, সন্তানের জন্মের কয়েকদিন পর শয়তান (অশুভ আত্মা) এই মহিলার বাড়িতে এসে শয়তান তার সন্তান এই মহিলার সন্তানের সাথে পরিবর্তন করে যায়। এরপর থেকে সাঁওতাল সম্প্রদায় তাদের সমগ্র জীবনে তিনটি অনুষ্ঠানে ধাতু ব্যবহার করা শুরু করে, অন্যথায় শয়তান তাদের ক্ষতি করতে পারে। (১)। প্রথম অনুষ্ঠানটি হল -জন্ম : (২) দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি তাদের বিয়ের সময়, এবং (৩) তৃতীয় অনুষ্ঠানটি যখন নববিবাহিত স্বামী এবং স্ত্রীকে নদী পার হতে বলা হয়।

যদিও তারা বিশ্বাস করে যে কঠোর পরিশ্রম পুরস্কার আনে, সাঁওতালরাও বিশ্বাস করে যে সাফল্য ভাগ্যের ফসল। "হনুমান ছেলের গল্প"-এ মা যখন হনুমান ছেলেটিকে গর্ভেধারণ করেছিলেন, লোকেরা তার সমালোচনা করেছিল। যাই হোক, তিনি শিশুটিকে পরিত্যাগ করেননি এবং পরিবর্তে স্বীকার করে ছিলেন যে ছেলেটিকে বহন করা তার ভাগ্য। আবার, যখন হনুমান ছেলেটি একটি মেয়েকে বিয়ে করার জন্য অপহরণ করে, তখন মেয়েটির বাবা-মা তাকে মেয়েটিকে মুক্ত করার জন্য অনুরোধ করে। হনুমান ছেলেটি তাকে ছেড়ে দেয়না এবং মেয়েটির বাবা-মা তার প্রত্যাখ্যানকে ব্যাখ্যা করেন যে হনুমানকে বিয়ে করা মেয়েটির ভাগ্য ছিল। এই ধরনের অনেক গল্পে দেখা যায় সাঁওতালরা দুর্ভাগ্যকে তাদের ভাগ্য হিসেবে গ্রহণ করে। উপসংহার, গবেষণায় দেখা গেছে যে সাঁওতালদের বিশ্বাস ব্যবস্থা তাদের প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সন্তান হিসাবে চিত্রিত করে। তারা সেই আত্মাগুলিতে বিশ্বাস করে যেগুলি বেঁচে থাকে এবং প্রকৃতিতে প্রকাশিত বা অভিজ্ঞ হয়, যেমন বন, পাহাড় বা গাছে। তারা প্রকৃতিতে এই আত্মা এবং দেবতাদের পূজা করে। যখন তারা অসুস্থ হয়, তারা প্রতিকারের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। ভাগ্যের প্রতি তাদের বিশ্বাস থেকেও বোঝা যায় যে সাঁওতালরা প্রকৃতির ইচ্ছা অনুযায়ী বাঁচে।

৫.৫ সুরেলা জীবন যাপন এবং প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা:

সাঁওতাল লোককথার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সুরেলা জীবন যাপন। প্রায় প্রতিটি সাঁওতাল লোককথায়, প্রাণী, আত্মা বা গাছ সহ বিভিন্ন চরিত্র রয়েছে। গল্পগুলির বিভিন্ন প্রজাতির চরিত্রগুলি সুরেলা ভাবে সহাবস্থান করে। তারা একে অপরকে সাহায্য করে, বিপদের সময় এক সাথে দাঁড়ায় এমন কি আন্তঃবিবাহ করে। "দ্য সিন্দুরা গ্যান্ড গারুর" এবং "দ্য জ্যাকাল অ্যান্ড লেপার্ড"-এ প্রধান চরিত্রগুলি মানুষ এবং প্রাণীদের একটি সুরেলা মিশ্রণ নিয়ে গঠিত। 'দুখু ও বঙ্গবউ' চরিত্রগুলো হচ্ছে মানুষ ও আত্মা, আর 'বোন জামাই যিনি ডাইনি ছিলেন' চরিত্রগুলো হলো মানুষ, পশু ও আত্মা। সাঁওতাল লোককাহিনীতে বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার ও বস্তু পাওয়া যায়। তন্মধ্যে তীর-ধনুক, কুড়াল, লাঙ্গল, ঢোল, লাঠি, পাই,

পয়লা, পাওয়া, বাঁশি, মালা এবং জয়ের পাখা অন্যতম। সাঁওতালদের তীর-ধনুক বাঁশ দিয়ে তৈরি। ‘দ্য স্টোরি অফ সিন্দুরা গান্ড গার্ল’, ‘লখন এবং বন্য মহিষ’ এবং ‘কারা এবং গুজা’ উল্লেখ করেছে যে স্থিতি বৃদ্ধি (একটি ডাইনি; স্থিতি এক ধরনের পোকা যা শুকনো বাঁশ খায়) রাতে ধনুক খেত। সাঁওতালরাও তাদের কৃষিকাজে সহায়তার জন্য বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করে। তাদের কৃষিসরঞ্জাম কাঠ থেকে তৈরি করা হয়। তাদের লাঙল ও কাঠ ও বাঁশ দিয়ে তৈরি। তারা বাঁশ থেকে লাঠি, বাঁশি, ঢোল, কুড়াল এবং বিজয়ী পাখার মতো হাতিয়ার ও তৈরি করে। সাঁওতাল মেয়েরাও নান্দনিক উদ্দেশ্যে বনফুল ব্যবহার করে।

৫.৬ সরল জীবনধারা

তাদের লোককাহিনীতে প্রমাণিত, সাঁওতালরা সরল জীবন যাপন করে। তাদের চাহিদার বেশির ভাগই প্রকৃতি থেকে সহজেই পাওয়া যায়। তাই সাঁওতালরা মজুত করে কিছু জিনিস, যেমন গরু এবং ছাগল, যা তারা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করে। অন্য সব কিছু সরাসরি প্রকৃতি থেকে চাওয়া হয়। সাঁওতালরা জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টি ভঙ্গিতে খুব বেশি আক্রমণাত্মক নয়। তারা প্রকৃতি এবং জীবনের প্রতি তাদের মনোভাব ফিরে পায়। তাদের বেশির ভাগ সময় অন্যান্য ব্যক্তি এবং প্রাণী এবং উপাসনা আত্মার সাথে সাধারণ কথোপকথনে ব্যয় হয়। অনেকটা যেমন হস্তক্ষেপ না করলে প্রকৃতি ফুলে ওঠে, তেমনি সাঁওতালরা জীবনকে সরলতার সাথে নিয়ে যায় এবং ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে। প্রকৃতপক্ষে, তাদের ঐতিহ্যবাহী আবাসস্থলগুলির বেশির ভাগই জঙ্গলে যা মানুষের আতিথেয়তা সত্ত্বেও তাদের প্রাকৃতিক চেহারা সংরক্ষণ করে। অতএব, প্রকৃতি তাদের ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করেছে এবং কী ভাবে বেঁচে থাকতে হয় তা শিখিয়েছে। গল্পগুলোতে ঐতিহ্যবাহী সাঁওতালদের মধ্যে হিংসা, ক্রোধ, লোভ, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা বা ব্যভিচারের বৈশিষ্ট্য বা অগ্রভাগের দিক নেই। সম্প্রদায়টিকে একটি সহজ এবং সুখী মানুষ হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে।

৬.০ উপসংহার

গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে যে সাঁওতালরা কীভাবে প্রকৃতির সন্তান এবং তাদের লোক কাহিনীতে দেখানো হয়েছে। সাঁওতালরা প্রকৃতির মধ্যে বা প্রকৃতিরই মাধ্যমে বসবাস করে। তারা প্রকৃতি থেকে খাদ্য, ঔষধ এবং বস্তু এবং সরঞ্জাম সংগ্রহ করে। প্রকৃতি সর্বদা তাদের জন্য উদার, তাদের যা প্রয়োজন তা সরবরাহ করে। তারা যে দেব-দেবীদের পূজা করে তারা প্রকৃতিতে বাস করে এবং পূজা প্রকৃতিতেও করা হয়। এই পূজা জাহের থানে করা হয়, একটি প্রাকৃতিক ভাবে গড়ে ওঠা পবিত্র উপবন। সাঁওতালরা বিশ্বাস করে যে জাদুবিদ্যার অস্তিত্ব রয়েছে এবং তা প্রকৃতিতে বসবাসকারী বিভিন্ন অশুভ আত্মার সাথে জড়িত।

প্রাণী, গাছ এবং আত্মার সাথে তাদের পরস্পর নির্ভরশীল সম্পর্ক রয়েছে। তারা প্রকৃতির দিকগুলি যেমন গাছ এবং প্রাণীদের সাথে তাদের ভাই এবং বোনের মতো আচরণ করে। প্রকৃতিও তাদের প্রতি সদয় কারণ এটি তাদের বাঁচতে সাহায্য করে এবং তাদের নিরাপদ রাখে। অনেক গল্প আছে যেখানে প্রাণীরা সাঁওতালদের বিপদ থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। তদুপরি, কিছু গল্পে সাঁওতালদের আত্মার সাথে আন্তঃবিবাহ চিত্রিত করা হয়েছে। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম এবং যন্ত্রগুলি কাঠ এবং লোহার মতো প্রাকৃতিক উপাদান থেকে তৈরি করে। সাঁওতালরা যেভাবে প্রকৃতির মধ্যে বসবাস করে এবং তাদের প্রকৃতির সন্তান হিসাবে চিত্রিত করে— প্রকৃতির সাথে তাদের সম্পর্ক পিতামাতা এবং সন্তানের মতো, বা ভাই এবং বোনের মতো।

তথ্যসূত্রঃ

- Prof. S. K. and G. K. 2016. Social Change in Contemporary Tribal India: Observation from Changing Status Ethnicity and Language identity among Santal's, *The Eastern Anthropologist*", 69 (2), 205-224.
- Akan, M. R., Al Mamun, M. A., Naznin, T., Al Pavel, M. A., Yasmin, L., & Rahman, S. A. 2015. An Ethnographic Investigation on Land and Life of Santal Community in Barnid Tract, *American Journal of Social Science Research*, 1 (2), 90-95.
- Ali, M.A. 1998. The Santal of Bangl (Mednipur): Samaj Sevak Sangha Press,
- Bandhopady. S. 2019. Lugubur; Ritual, Pilgrimage and Quest for Identity among Santal's, *The Oriental Anthropologist* 19(1), 41-54.
- Brandt, C. 2011. Educating Santals: (Bangladesh) The Seventh day Adventist Church
- Bascom, W. R. 1953. Folklore and Anthropology, *The Journal of American Folklore*, 66(262), 283290?
- Biswas, M. 2018. Schedule Tribe in India: Socio Cultural Change of Santal Tribe in West Bengal, *International Journal of Applied Social Science*, 5(7), 1090-1100.
- Boas, F. 1940. Race, Language and Culture:
- Canny, M.A 1928. The Santal and their Folklore. *Folklore*, 39(4), 329-343.
- Carrin, M. 2015. Performing Indigeneity and Politics of Representation: the Santal in Jharkhand, Odisha, Asham and West Bengal, *Irish Journal of Anthropology*, 18(2), 21-31.
- Cavallaro, Francesco and Rahman, Tania 2009. The Santal's of Bangladesh, *A Linguistics Journal*, <https://www.researchgate.net/publication/330281849>.
- Datta. S. 2018. Setting the Untruly Tract : Representation of the Counter Spatial Tactics Ideas on Environment and Justice among Santal's in 18th Century Folklores, *Studies in Humanities and Social Science* 25(1), 169-192.
- Dey. A. 2015. An Ancient History: Ethnographic Study of the Santal; *International Journal of Novel Research in Humanity and Social Science*, 2(4), 31-38?
- Dorson, R. M. 1963. Current Folklore theories, *Current Anthropology* 4(1), 93-112.
- Esnara, C.B. 2022. Translanguaging in analysis of narrative techniques and discourses in selected Philippines short novels, *Research Journal in Advanced Humanities*, 3(4), 99-114. <https://doi.org/10.58256/rjah.v3i4.960>
- Guha. S., and Ismail, M. 2015. Socio- Cultural Changes of tribe and their impact on Environment with special reference to the santal of West Bengal , *Global Journal of Interdisciplinary Social Science*, 4(3), 148-156?
- Gautam, M. 1977. Santalization of the Santals. K. David (Ed.). *The New Wind: Changing Identity in South Asia* (p. 369-382)? <https://doi.org/10.1515/9783110807752.369>
- Hasdak, J. 1981. Hor Hopon: Santal Itihas, (Santal's Cultural Center)
- Hembram, R. 2018. The Life and After Life of Orality: Karam Binti and the Santal Identity: 13 September 2018?
- Kerketa, V. J. 2018. The Santal's Beliefs System. *International Journal of Engineering Development and Research*, 6(1), 205-214?
- Lea, S. D. 2016. Making place through rituals; (PhD) Thes is
- Lopez, M. 2006. *Handbook of Philippines Folklore*. Diliman, Quezon City. The University of the Philippines Press.
- Mohanty, S. 2021. *Mainstreaming the Marginalized: Fresh Perspectives on India's Tribal Story*. <https://doi.org/10.4324/97810030000983>
- Murmu, G. *Illustration for the Folklore of the Santal Parganas*, <http://www.dsourcein/sites/default/files/case-study/folklore-santal-parganas/introduction/file/folklore-of-the-santalparganas.pdf>

Propp, V. 1984. Thoery and History of Folklore.

Raj. A. 2018. Is witchcraft is surpressed desire of women empowerment in Santal society? A study in selected Santal folktales. *International Journal of Recent Scientific Research*, 9(3B), 24754-24756.

Ray. M. 2016. Life and Cultures of the Santal in Jalpaiguri District in the 20th century: A Historical Outline. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 3(4), 221-228?

Samad, M. 2006. The Santal in Bangladesh: Problems, Needs and Development Potential" *A Journal of ethnic affairs*, II (August), 9-13.

Saren. G 2013. Impact of Globalization on Santal's: a Study on Migration in West Bengal, India. *International Journal Humanities and Social Science invention*, 2(7), 29-33?

Shamsuddoha, B., and Johan. R. 2016. Santal Community in Bangladesh: A socio Historical analysis, 3(3), 203-214.

Shariff, F. 2008. Power Relation and Legal Pluralism: an examination of strategies of struggles among the Santal adivasi of India and Bangladesh. *The Journal of legal Pluralism and unofficial law*, 40(57), 1-43?

Siwakoti, B. 2017. Archetypal study of Santal's folktales. Tribhuvan University, Nepal

Soren, Priyanka and Jamie Waluneba. 2021. A Study on the Folklore of the Santal's in Relevance to Folklores and Superstations <https://doi.org/10.22271/ed.book.807>

Tank. N. 2019. Binti: Re-Thinking Santal Identity through Creation Myth. Lokaratna, XII, 17-28? Worldmak Encyclopedia of Daily life and Cultures (2022)

Santal, Encyclopedia.com, 20 December, 2022: <https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacstranscripts-and-maps/santals>

লেখক পরিচিতি :

স্বাধীন গবেষক, স্নাতকোত্তর, ইংরেজি বিভাগ, ২০১৯, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

Email: murmubablu9800@gmail.com

